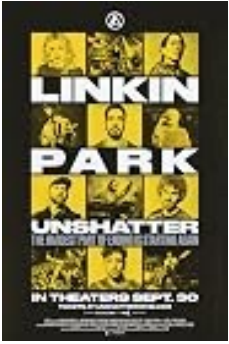


যে সিনেমা আসছে



যে সিনেমা আসছে



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, দ্বাবিংশ সংখ্যা, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ২, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ২০

উদ্বৃত্ত সম্পদ উদ্ধারকার্য

নয়াদিগ্লি: সরকারের উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত সম্পদের মূল্য উন্মোচনের প্রক্রিয়ায় গতি বাড়ানোর উপর জোর দিল ন্যাশনাল ল্যান্ড মনিটাইজেশন কর্পোরেশন বা এনএলএমসি। ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সংস্থার ২১তম পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের উদ্বৃত্ত জমি ও ভবন নগদীকরণের প্রস্তাব বিবেচনা করে সুপারিশ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং পরিচালকদের প্রতিবেদন অনুমোদন করেছে পর্ষদ। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত সম্পদ নগদীকরণের ক্ষেত্রে এনএলএমসির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে উপযুক্ত সম্পদ চিহ্নিত করা, প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই, সম্পদের মূল্যায়ন এবং নগদীকরণের উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণের কাজ করছে এনএলএমসি। পর্ষদের বৈঠকে সম্পদ নগদীকরণের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত সম্পদগুলিকে স্বচ্ছ ও উপযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নগদীকরণের পর্যায়ে নিয়ে আসতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য আংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার বৃহত্তর লক্ষ্যের অংশ হিসেবেই উদ্বৃত্ত জমি ও ভবনের নগদীকরণ করা হচ্ছে। কোনও সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা এমন সম্পদ, **দ্বিতীয় পাতায়**

দিগ্লিতে সেমিকন সমাপ্তি

নয়াদিগ্লি: নয়াদিগ্লির যশোভূমিতে তিন দিনের সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬-এর সফল সমাপ্তি হল। ১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর আয়োজিত ভারতের এই পঞ্চম সেমিকনভাস্টার সম্মেলনে ৫১,৬৫৬ জনের নিবন্ধন হয়েছে এবং তিন দিনে মোট প্রায় ৪০ হাজার মানুষের উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে। ‘সিলিকন থেকে সিস্টেম: শিল্প-পরিবেশ গড়ে তোলা’—এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত সম্মেলনে ৬০০-র বেশি প্রদর্শক অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৩০০টি ছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা। ৫২টি দেশের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ছয়টি দেশের প্যাভিলিয়ন এবং ১২টি রাজ্যের প্যাভিলিয়নও সম্মেলনে অংশ নেয়। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, সিঙ্গাপুর ও সুইডেনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ছয়টি দেশের প্যাভিলিয়নের স্টার্টআপ প্যাভিলিয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্র, উদ্ভাবন প্রদর্শনী এবং ছাত্রদের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। তিন দিনে মোট ৫৬টি সমঝোতাপত্র, ঘোষণা ও কৌশলগত উদ্যোগের কথা সামনে এসেছে। চিপের নকশা, উৎপাদন, উন্নত প্যাকেজিং, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, শক্তি-ইলেকট্রনিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং, গবেষণা ও উন্নয়ন, পণ্য পরিবহণ, প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন—বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি

নীতি ও প্রকল্প পরিকল্পনার পর্যায় পেরিয়ে ভারতের সেমিকনভাস্টার শিল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনের পর্যায়ে পৌঁছানোর বিষয়টি তুলে ধরেন। তরুণ চিপ নকশাবিদ ও ছাত্রদের সঙ্গে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। মহালেতে সিডিআইএল সেমিকনভাস্টার এবং সুরতে সূচি সেমিকনের বাণিজ্যিক উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধনও ভার্চুয়াল মাধ্যমে করেন তিনি।

এর ফলে সেমিকন ১.০-এর আওতায় অনুমোদিত ১২টি প্রকল্পের মধ্যে বাণিজ্যিক ভাবে চালু প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ হয়েছে।

এর পাশাপাশি সেমিকন ২.০-এর পরবর্তী পর্যায়ের রূপরেখাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০০

কোটি টাকার বরাদ্দে এই কর্মসূচির আওতায় চিপের নকশা, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, নতুন ফ্যাব, উন্নত প্যাকেজিং, গবেষণা এবং দক্ষ মানবসম্পদ—এই ছয়টি ক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি, রেল এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সেমিকন ২.০ বাস্তবায়নের কাঠামো ব্যাখ্যা করেন। চিপের নকশা, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, ফ্যাব, উন্নত প্যাকেজিং, প্রয়োগভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উঠে আসে আলোচনায়।

পাশাপাশি স্থিতিশীল সরবরাহশৃঙ্খল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর চিপ নকশা ও উৎপাদন, উন্নত প্যাকেজিং, দেশীয় গবেষণা, শক্তি-ইলেকট্রনিক্স, প্রদর্শন প্রযুক্তি এবং সেমিকনভাস্টার শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়েও আলোচনা হয়।

তিন দিনের আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে, সেমিকনভাস্টার শিল্প গড়ে তোলার অর্থ শুধু ফ্যাব তৈরি করা নয়। উৎপাদন-যন্ত্র, উপকরণ, গ্যাস, রাসায়নিক, নির্ভুল যন্ত্রাংশ, মেধাস্বত্ব এবং দক্ষ মানবসম্পদ—পুরো

পরিকাঠামোকেই একই সঙ্গে শক্তিশালী করতে হবে। সেই বৃহত্তর শিল্প-পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যেই ‘সিলিকন থেকে সিস্টেম’-এর ভাবনাকে সামনে রাখা হয়েছে।

সম্মেলনের শেষ দিনে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, শিল্পের সঙ্গে সহযোগিতা, ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা, **দ্বিতীয় পাতায়**



বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে ৩.২%

২০-তম রোজগার মেলায় ৫১ হাজারকে চাকরি

চেন্নাই: দেশজুড়ে ৪৫টি কেন্দ্রে আয়োজিত ২০তম রোজগার মেলায় ৫১ হাজারের বেশি নবনিযুক্ত যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চেন্নাইয়ে আয়োজিত রোজগার মেলায় ২৮৫ জন নবনিযুক্ত প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. এল মুরুগন। ডি জি বৈষ্ণব কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে আয়কর দপ্তর, কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম, ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, ডাক দপ্তর, জওহরলাল ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্রাডুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ এবং দক্ষিণ রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চলা প্রার্থীরাও রয়েছেন। অনুষ্ঠানে ড. এল মুরুগন বলেন, নবনিযুক্ত যুবক-যুবতীরা ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তাঁর বক্তব্য, নিয়োগপত্রকে কেবল চাকরি পাওয়ার নথি হিসেবে দেখলে চলবে না। এর সঙ্গে দেশের মানুষের সেবা করার দায়িত্বও যুক্ত রয়েছে। সরকারি কর্মীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সময় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তাই সরকারি পরিষেবায় সততা, জবাবদিহি, সহমর্মিতা



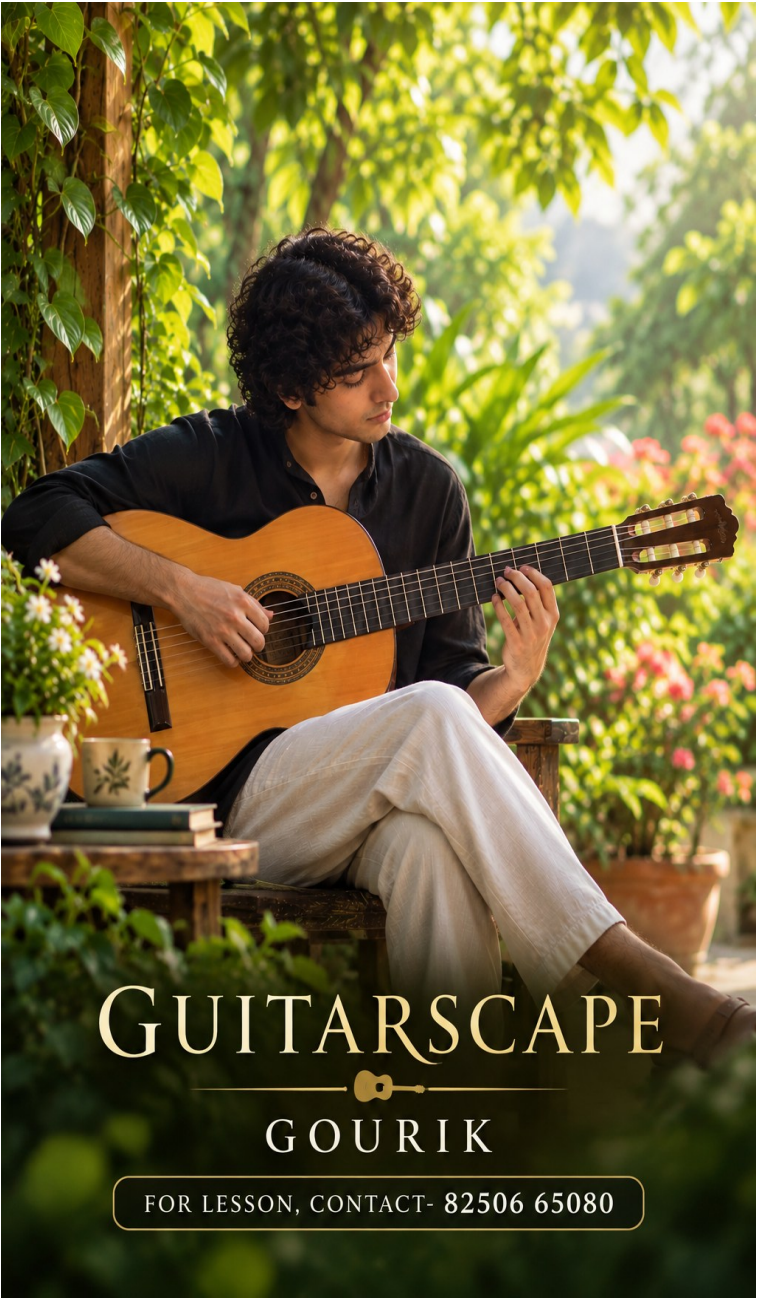
উদ্যোগের ফলে দেশে বেকারত্বের হার ৬ শতাংশ থেকে কমে ৩.২ শতাংশ হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে দেশে যেখানে স্টার্টআপের সংখ্যা প্রায় ৪০০ ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি হয়েছে। এই স্টার্টআপগুলির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠাতার বয়স ৩০ বছরের নিচে বলেও জানান তিনি। যুবকদের নিয়মিত

নতুন জ্ঞান অর্জন, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং নিজেদের পেশাগত দক্ষতার ধারাবাহিক উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে মহাকাশ প্রযুক্তি এবং পারমাণবিক শক্তির মতো নতুন ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষেত্রে যুবকদের জন্য তৈরি হওয়া সুযোগের কথাও উঠে আসে। একইসঙ্গে মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, প্রশাসন ও সরকারি পরিষেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি।

এল মুরুগন জানান, এখনও পর্যন্ত রোজগার মেলার মাধ্যমে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তামিলনাড়ুর নবোদয় বিদ্যালয় নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুরুগন। তাঁর দাবি, এই বিদ্যালয়গুলি আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের

পড়ুয়াদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ দেবে। পাশাপাশি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা শেখার সুযোগও তৈরি হবে বলে জানান তিনি। অনুষ্ঠানে তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির আয়কর দপ্তরের প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার সুনীল বাজপেয়ী-সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, নবনিযুক্ত প্রার্থী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।



GUITARSCAPE
GOURIK
FOR LESSON, CONTACT- 82506 65080



সম্পাদকীয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতিগুলির একটি ছিল— মানুষের চিন্তার গতি বাড়ানো। কিন্তু এখন সেই প্রতিশ্রুতি ধীরে ধীরে আরও এক ধাপ এগোচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু গবেষকের কম্পিউটারের পর্দায় থাকবে না, গবেষণাগারের বাস্তব পরীক্ষার টেবিলেও তার উপস্থিতি তৈরি হবে। অ্যানথ্রপিকের গোপনে একটি ‘ওয়েট ল্যাব’ তৈরি করার খবর সেই পরিবর্তনেরই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। এখানে ঘটনাটির তাৎপর্য ল্যাবরেটরি তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এত দিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে জীববিজ্ঞানের গবেষণার বড় অংশ ছিল ‘ইন সিলিকো’—অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্ভাব্য অণু, প্রোটিন বা জৈবিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিশ্লেষণ। কিন্তু জীববিজ্ঞানের শেষ পরীক্ষা এখনও বাস্তব জগতে। একটি সম্ভাব্য ওষুধ কম্পিউটার মডেলে যতই কার্যকর মনে হোক, জীবন্ত কোষ, অণু কিংবা শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীরে তার আচরণ কেমন হবে, তা জানতে বাস্তব পরীক্ষা অপরিহার্য। অ্যানথ্রপিকের জীবনবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এরিক কডেরার-আব্রামসও সেই বাস্তবতার কথাই বলেছেন।

এখানেই শুরু হচ্ছে আসল পরিবর্তন। অ্যানথ্রপিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, তার ক্লদ এআই ভবিষ্যতে রোবোটিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ দিয়ে মানুষের সীমিত হস্তক্ষেপে পরীক্ষাগারের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে পারে। পরীক্ষার একটি ফলাফল পরবর্তী পরীক্ষার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোবোটিক ব্যবস্থা নতুন পরীক্ষা চালাবে এবং সেই ফলাফল আবার এআইয়ের বিশ্লেষণে ফিরে আসবে—এমন একটি চক্র তৈরি হলে গবেষণার গতি আমূল বদলে যেতে পারে। আজকের গবেষণাগারে একজন বিজ্ঞানীকে যে কাজের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়, ভবিষ্যতে তার একটি অংশ হয়তো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাই সম্পন্ন করবে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন কিছু সম্ভাবনাও সামনে আনতে পারে, যা মানুষের পক্ষে খুঁজে বের করা দীর্ঘ ও কঠিন প্রক্রিয়া। বিরল রোগের চিকিৎসা, বর্তমানে ‘ওষুধ

তৈরি করা কঠিন’ বলে বিবেচিত রোগের জন্য নতুন অণু খোঁজা কিংবা জটিল অ্যান্টিবডি তৈরির মতো ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি বিশেষ পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু এখানেই আশাবাদের পাশাপাশি একটি বড় প্রশ্নও রয়েছে। জীববিজ্ঞান এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ভুলের মূল্য অন্য অনেক গবেষণার তুলনায় অনেক বেশি। একটি কম্পিউটার মডেলের ভুল পূর্বাভাসে হয়তো সময় বা অর্থ নষ্ট হতে পারে; কিন্তু ভুল জৈবিক পরীক্ষার পরিণতি আরও গুরুতর হতে পারে। আর সেই কারণেই অ্যানথ্রপিকের মতো সংস্থার ক্ষেত্রে এআইয়ের সক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ অ্যানথ্রপিক নিজেই সম্প্রতি এমন সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করেছে, যেখানে উন্নত এআই ব্যবস্থাকে জৈবিক অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। একদিকে সংস্থাটি বলেছে, এআই মানুষের বিলুপ্তির মতো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে; অন্যদিকে সেই একই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসার গবেষণাকে দ্রুততর করার চেষ্টা করছে। এই দ্বৈততাই সম্ভবত আগামী দিনের এআই যুগের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। প্রযুক্তি নিজে কোনও নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় না। তাকে কী কাজে ব্যবহার করা হবে, কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং কোথায় মানুষের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে—সেই সিদ্ধান্তই আসল। তাই এআই-নির্ভর গবেষণাগারের ক্ষেত্রে ‘মানুষকে সরিয়ে দেওয়া’ নয়, বরং মানুষের গবেষণাক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলাই হওয়া উচিত লক্ষ্য। অ্যানথ্রপিকের ওয়েট ল্যাবকে কেবল একটি প্রযুক্তি সংস্থার নতুন বিনিয়োগ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি এআই এবং জীববিজ্ঞানের সীমানা ক্রমশ মুছে যাওয়ার একটি ইঙ্গিত। আগামী দিনের গবেষণাগারে বিজ্ঞানী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবোটিক ব্যবস্থা একই সঙ্গে কাজ করতে পারে। সেই ভবিষ্যৎ কতটা দ্রুত আসবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু দরজা যে খুলে গেছে, অ্যানথ্রপিকের এই পদক্ষেপে তার ইঙ্গিত।

উদ্বৃত্ত সম্পদ

প্রথম পাতার বাকি অংশ
যা বর্তমানে পর্যাপ্ত ভাবে ব্যবহার হচ্ছে না, সেগুলির আর্থিক মূল্য উন্মোচনের মাধ্যমে সম্পদ-স্বত্বাধিকারী সংস্থাগুলিকে বাণিজ্যিক ভাবে উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করে দেওয়াই এই প্রক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্য। পর্যদ এনএলএমসির অগ্রগতির প্রশংসা করার পাশাপাশি নগদীকরণ প্রক্রিয়ার গতি বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে। একইসঙ্গে সম্পদ-স্বত্বাধিকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদগুলিকে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নগদীকরণের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
বৈঠকে এনএলএমসির ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং পরিচালকদের প্রতিবেদনও অনুমোদন করা হয়। পাশাপাশি সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার জন্য চলতি উদ্যোগগুলিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৫ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের সম্পদের নগদীকরণ প্রস্তাব সুপারিশ করার বিষয়টি সরকারের সম্পদ নগদীকরণ কর্মসূচিতে এনএলএমসির ক্রমবর্ধমান ভূমিকারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সংস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি ও ভবনের মতো সরকারি সম্পদের আর্থিক মূল্যকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি সম্পদ-স্বত্বাধিকারী সংস্থাগুলিকে স্বচ্ছ এবং বাণিজ্যিক ভাবে উপযুক্ত নগদীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণে সহায়তা করা হচ্ছে।
এনএলএমসি অর্থ মন্ত্রকের অধীন সরকারি উদ্যোগ দপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভারত সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত জমি ও ভবন চিহ্নিত করা, মূল্যায়ন করা এবং উপযুক্ত ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সেগুলির নগদীকরণে সহায়তা করাই সংস্থাটির মূল দায়িত্ব। সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার বৃহত্তর কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই কাজ চালিয়ে যাবে এনএলএমসি।

সেমিকন সমাপ্তি

প্রথম পাতার বাকি অংশ
পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, প্রদর্শন প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং গভীর প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়। দেশীয় উদ্ভাবন এবং গবেষণাকে বাজার ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।দেশীয় চিপ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আরআইএসসি-ভি গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ বিশেষ নজর কেড়েছে। চিপস টু স্টার্টআপ কর্মসূচির আওতায় এই প্রতিযোগিতায় ১,২৩৬টি দল এবং ৫,০৪৫ জন অংশগ্রহণ করেন। দেশীয় ভেগা ও শক্তি প্রসেসরভিত্তিক সিস্টেম-অন-চিপ ব্যবহার করে তৈরি সমাধানের জন্য সফল দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্টার্টআপ প্রতিযোগিতা ও ছাত্রদের উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার বিজয়ীদেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
শিল্পের প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধানে ছাত্রদের যুক্ত করতে কেএলএ, সিনপসিস এবং ল্যাম রিসার্চের উদ্যোগে তিনটি প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়। সেন্টার ফর ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আইআইএসসি-র সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাগুলিতে ৯০০-র বেশি কলেজ থেকে ৩,৮০০-র বেশি দলের নিবন্ধন হয়। সফল অংশগ্রহণকারীদের নগদ পুরস্কার, শিক্ষানবিশের সুযোগ, সফটওয়্যার সরঞ্জাম এবং কম্পিউটিং সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও ছিল সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিন দিনে ছয়টি দেশের সঙ্গে পৃথক গোলটেবিল বৈঠক হয়। ভারত-আমেরিকা বৈঠকে ১৮০ জন এবং ভারত-জাপান বৈঠকে ২০০ জন অংশ নেন। দ্বিতীয় দিনে ভারত-সিঙ্গাপুর বৈঠকে ১৪২ জন, ভারত-ইউরোপ বৈঠকে ১৩৯ জন এবং ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া বৈঠকে ১১৫ জন অংশ নেন। শেষ দিনে ভারত-মালয়েশিয়া বৈঠকে প্রায় ১৫০ জন অংশ নেন। উৎপাদন, উন্নত প্যাকেজিং, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, বিনিয়োগ, গবেষণা, দক্ষতা এবং সরবরাহশৃঙ্খল নিয়ে এই বৈঠকগুলিতে আলোচনা হয়।

সেমিকনের নতুন ঠিকানা কি পূর্ব ভারত? - একটি রিপোর্ট

শিবাজী লাহিড়ী

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ভারতের অগ্রগতি, অপ্রতিহত। ইলেক্ট্রনিক্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, পৃথিবীর বিশ্বশক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ, ভারতের এই দুর্নিবার গতিকে, রুদ্ধ করার চেষ্টা করলেও করতে পারে। সুতরাং, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই, যে ভারত এখনও টেকনোলজিসহ অন্যান্য সেক্টরগুলিতে পৃথিবীর সেমিকন সুপার পাওয়ারদের মুখাপেক্ষী। বরং সেমিকন ইন্ডিয়ার মধ্যে, ভারতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ভারতীয় সংস্থার দ্বারা নির্মিত চিপের প্রদর্শন, শ্রী বৈষ্ণবের চিন্তাতেই আরও বেশি শিলমোহর দেয়। একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর ওপরে নির্ভরশীল। সেই সাংবিধানিক কাঠামোর অন্যতম শরিক দেশের রাজ্যগুলি। রাজ্যগুলির ক্ষমতায়নকে সুস্পষ্ট করতে সংবিধানের চতুর্থ ভাগে, ৩৬ থেকে ৫১ নম্বর ধারায় ‘ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসিজ’- রয়েছে। সেই ধারার ব্যবহারে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, একটি রাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করতে পারে। সেমিকন শিল্প সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবহার করতে, ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, আসাম, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি নিজস্ব ইলেক্ট্রনিক্স পলিসি, সেমিকন্ডাক্টর পলিসির রূপায়ণ করেছে। এই পলিসিগুলির আওতায়, একদিকে যেমন রয়েছে শিল্প বিস্তারের রূপরেখা, ঠিক একইভাবে জমি, জল সংক্রান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণের পাশাপাশি, কীভাবে সেই পরিবেশকে ব্যবহার করে আরও বিনিয়োগ সম্ভাবনার দরজা নতুন করে খোলা যায়- তার চেষ্টাও।

সেমিকন্ডাক্টর শিল্প নিয়ে ভারতের উদ্যোগ যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে এই শিল্পকে শুধু চিপ তৈরির কারখানা দিয়ে বিচার করা যায় না। চিপের নকশা থেকে শুরু করে, গবেষণা, কাঁচামাল, উৎপাদন, উন্নত প্যাকেজিং, পরীক্ষা, যন্ত্রপাতি, দক্ষ কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প—সব মিলিয়েই তৈরি হয় সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো। দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলি সেই বৃহত্তর শিল্প-পরিবেশ তৈরির জন্য নিজেরে নীতি ও বিনিয়োগ প্রস্তাব সামনে আনলেও পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়।

বর্তমান নিবন্ধের মূল লক্ষ্য, পূর্ব ভারতের সেমিকন ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনে উদ্যোগী রাজ্যগুলি -যেমন ওড়িশা ও আসামের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানকে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা। পাশাপাশি, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ এই শিল্পে এগিয়ে যেতে পারে, তার যথাযথ রূপরেখাও তুলে ধরা।

ওড়িশা: নীতি থেকে শিল্প-বাস্তবায়নের পথে

পূর্ব ভারতের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই নজর পড়ে ওড়িশার দিকে। খনিজ ও ভারী শিল্পনির্ভর অর্থনীতির পরিচিত গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পকে নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে রাজ্যটি। সেই উদ্যোগের অন্যতম ভিত্তি ‘ওড়িশা সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিলেশন পলিসি, ২০২৩’। নীতির ঘোষিত লক্ষ্যই হল, রাজ্যে প্রান্ত-থেকে-প্রান্ত সেমিকন্ডাক্টর শিল্প-পরিবেশ তৈরি করা। একই সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর নকশা ও উৎপাদনের কেন্দ্র, গবেষণা ও নকশাভিত্তিক নতুন সংস্থার কেন্দ্র এবং সেমিকন্ডাক্টর নকশায় দক্ষ মানবসম্পদের অন্যতম ভাণ্ডার হিসেবে ওড়িশাকে গড়ে তোলার লক্ষ্যও সেখানে রাখা হয়েছে।

এই নীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে শুধুমাত্র একটি ফ্যাব বা চিপ উৎপাদন কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। উৎপাদনের পাশাপাশি চিপের নকশা, গবেষণা, পরীক্ষা, প্যাকেজিং, দক্ষ মানবসম্পদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকে বৃহত্তর শিল্প-পরিবেশের অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে। নীতিতে অত্যাধুনিক

নকশা ও পরীক্ষার পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে, যেখানে নতুন উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠিত সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে কাজ করতে পারবে। নীতিকে ঘোষণার স্তরে রেখেও থেমে থাকেনি ওড়িশা। ২০২৫ সালের ৬ মে ওড়িশার ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর- এই নীতির অধীনে মূলধনী বিনিয়োগ ভর্তুকি প্রদানের কার্যকরী নির্দেশিকা প্রকাশ করে। সেখানে কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর, সিলিকন ফোটোনিك্স, সেন্সর ফ্যাব এবং সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি, টেস্টিং, মার্কিং অ্যান্ড প্যাকেজিং বা এটিএমপি এবং ওএসএটি প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, বর্তমান ব্যবস্থায় নীতির অধীনে অনুমোদনের জন্য আবেদন ২০৩০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রহণের কথা রয়েছে। ঠিক এখানেই সুস্পষ্ট হয় ওড়িশার সেমিকন শিল্পায়ন অভিযুক্তের চরিত্রটি। রাজ্যটি শুধু সেমিকন্ডাক্টর ‘চিপ’ উৎপাদনের দিকে তাকিয়ে নেই; বরং উৎপাদনের আগে ও পরে থাকা শিল্পের বিভিন্ন স্তরকেও নিজের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করছে। সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটি চিপ তৈরির সঙ্গে নকশা, ওয়েফার, উপাদান, যন্ত্রপাতি, প্যাকেজিং, পরীক্ষা এবং বিভিন্ন বিশেষ পরিষেবা যুক্ত থাকে। এই বিস্তৃত মূল্যশৃঙ্খলের যত বেশি অংশ একটি অঞ্চলে তৈরি করা যায়, ততই একটি একক কারখানাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট শিল্প ও কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনা বাড়ে।

২০২৩ সালেই পৃথক সেমিকন্ডাক্টর নীতি

ওড়িশা ও অসমের, উৎপাদনের পাশাপাশি

চিপের নকশা, গবেষণা, প্যাকেজিং ও দক্ষ

কর্মী তৈরিতে জোর। পশ্চিমবঙ্গের ২০১২

সালের নীতিতেও ছিল সেমিকন্ডাক্টর

কারখানা ও চিপের নকশার পরিকল্পনা।

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে পূর্ব ভারতের তিন

রাজ্যের নীতি-কাঠামো ও শিল্প-উদ্যোগ

নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন। প্রথম অংশ

ওড়িশার এই নীতি-অভিযুক্ত সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬-এর মধ্যেও স্পষ্ট হয়েছে। নয়াদিল্লির যশোভূমিতে আয়োজিত সম্মেলনে ওড়িশা সরকার সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের পাশাপাশি উন্নত প্যাকেজিং, চিপের নকশা এবং ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরে। রাজ্য সরকারের দাবি অনুযায়ী, এবারের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মোট ২৩,৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে, যেগুলি বাস্তবায়িত হলে প্রায় বিপুল প্রশিক্ষিত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, কটকের কাছে নারাজে ৮৭০ একর জমির উপর ‘ওড়িশা সিলিকন ভ্যালি’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ওড়িশা সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এই প্রস্তাবিত প্রযুক্তি কেন্দ্রে সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পগুলিকে একই পরিসরের মধ্যে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬ চলাকালীন সিলিকন কার্বাইড সাবস্ট্রেট ওয়েফার উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির জন্য কোয়াদকোয়ান্টামের সঙ্গে একটি আগ্রহপত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছে। একই সঙ্গে একাধিক দেশি-বিদেশি সেমিকন্ডাক্টর ও প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে ওড়িশা সরকারের শিল্প-আলোচনা হয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে।

শিল্প বিনিয়োগের পাশাপাশি গবেষণা ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রেও আলাদা পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় ভূবনেশ্বর তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে ‘সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ডিভাইসেস’ উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৪০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। রাজ্য সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এর উদ্দেশ্য দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

এই জায়গাতেই ওড়িশার উদ্যোগকে শুধু আর্থিক গোপদনার অঙ্ক দিয়ে বিচার করলে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে যায়। একদিকে যেমন রাজ্যটি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য পৃথক সেমিকন্ডাক্টর নীতি

তৈরি করেছে, অন্যদিকে গবেষণা, দক্ষ মানবসম্পদ এবং শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল তৈরির চেষ্টাও করছে।

অর্থাৎ নীতি, পরিকাঠামো, গবেষণা, দক্ষতা ও বিনিয়োগ—এই কয়েকটি স্তরকে একই শিল্প-কৌশলের মধ্যে আনার প্রচেষ্টা ওড়িশার সেমিকন্ডাক্টর নীতির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান।

তবে এই পরিকল্পনার প্রকৃত সাফল্য বিচার করতে হলে আগামী কয়েক বছরে দেখতে হবে ঘোষিত বিনিয়োগের কতটা বাস্তবে উৎপাদনে পৌঁছয়, কতগুলি প্রকল্প কার্যকর হয়, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কতটা তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং ঘোষিত কর্মসংস্থানের কতটা বাস্তবায়িত হয়। কারণ নীতি ও বিনিয়োগ প্রস্তাব একটি শিল্প-পরিবেশ তৈরির প্রাথমিক শর্ত হলেও, তার চূড়ান্ত মাপকাঠি হল প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

অসম: সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে জাগিরোডকে

কেন্দ্র করে নতুন শিল্প-পরিবেশ
সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে অসমের গুরুত্ব গত কয়েক বছরে দ্রুত বেড়েছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে মরিগাঁও জেলার জাগিরোডে টাটা ইলেকট্রনিক্সের বৃহৎ সেমিকন্ডাক্টর সংযোজন ও পরীক্ষাকেন্দ্র। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত সরকার এই প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। টাটা ইলেকট্রনিক্সের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রকল্পটিতে প্রায় ২৭,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৭,০০০-এর বেশি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

জাগিরোডের প্রকল্পটি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কারখানা বা ‘ফ্যাব’ নয়। এটি মূলত সেমিকন্ডাক্টর সংযোজন ও পরীক্ষা কেন্দ্র, অর্থাৎ উৎপাদিত ওয়েফারকে পরবর্তী পর্যায়ে প্যাকেজিং, সংযোজন এবং পরীক্ষা করে চূড়ান্ত ব্যবহারের উপযোগী চিপে পরিণত করার পর্ব। টাটা ইলেকট্রনিক্সের পরিকল্পনায় তার-সংযোগ, ফ্লিপ-চিপ এবং সমন্বিত ব্যবস্থা-ভিত্তিক প্যাকেজিং প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্যাকেজিং প্রযুক্তি যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

এই প্রকল্পের গুরুত্ব শুধু বিনিয়োগের অঙ্কে নয়। সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের

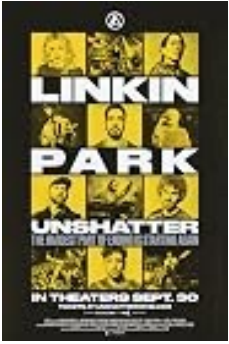
মূল্যশৃঙ্খলে সংযোজন ও পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ভারত সরকারের অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যাখ্যায়ও বলা হয়েছে, ফ্যাবে তৈরি ওয়েফার পরবর্তী পর্যায়ে সংযোজন বা প্যাকেজিং এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ব্যবহারের উপযোগী হয়। জাগিরোদের এই কেন্দ্র তাই ভারতের বৃহত্তর সেমিকন্ডাক্টর শিল্প-পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে। বৃহৎ শিল্পপ্রকল্পের পাশাপাশি অসম সরকার সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের জন্য পৃথক নীতি তৈরি করেছে।

‘অসম ইলেকট্রনিক্স (সেমিকন্ডাক্টর ইত্যাদি) নীতি, ২০২৩’ বর্তমানে রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের নীতি-তালিকায় রয়েছে। নীতিটির মূল উদ্দেশ্য অসমকে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারি নথিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মেধা-পলায়ন কমানো, শিল্পের মূল্যশৃঙ্খলা শক্তিশালী করা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও বাণিজ্যের মাধ্যমে অসমকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে।

এই নীতির মেয়াদ পাঁচ বছর। অসম সরকারের ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষাতেও নীতিটির উদ্দেশ্য হিসেবে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মেধা-পলায়ন রোধ এবং শিল্পের মূল্যশৃঙ্খলা শক্তিশালী করার কথা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অসমের সেমিকন্ডাক্টর উদ্যোগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়েছে— একদিকে নির্দিষ্ট নীতি-কাঠামো, অন্যদিকে জাগিরোডে একটি বৃহৎ শিল্পপ্রকল্প।

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের একটি বড় প্রকল্পকে ফিক্স করতে শুধু মূল কারখানা তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন যন্ত্রপাতি, উপাদান, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং পরিষেবার একটি বিস্তৃত সরবরাহশৃঙ্খলা। জাগিরোডের ক্ষেত্রেও সেই ধরনের একটি পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। টাটা ইলেকট্রনিক্স ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে।

(আগামী সংখ্যায়)



স স্মি লি তে র বি শ্ব দ র্ প ণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, সোমবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ৩, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ২১

পশ্চিমবঙ্গের মৎসচাষ নিয়ে কেন্দ্র- রাজ্য বৈঠক

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ও জলজ চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনের রূপরেখা তৈরি করতে আজ কলকাতায় কেন্দ্র ও রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক বসছে। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ এবং পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যৌথভাবে বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। এক দশকেরও বেশি সময় পর এই স্তরের মৎস্য বিষয়ক পর্যালোচনা বৈঠক হচ্ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় মৎস্য দফতর। বৈঠকে রাজ্যের মৎস্য ও জলজ চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি, জলজ চাষের সম্প্রসারণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। বৈঠক শেষে পশ্চিমবঙ্গে সমন্বিত জলাধার উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদনও হস্তান্তর করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রাজেশ মাহাতার উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মৎস্য দফতরের অধিকারিকদের পাশাপাশি জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড, ভারতীয়

দ্বিতীয় পাতায়

কোল ইন্ডিয়ার রূপান্তর

নয়াদিল্লি: প্রচলিত কয়লা খনির ব্যবসার গণ্ডি পেরিয়ে শক্তি, খনিজ, উন্নত উপাদান এবং গবেষণা ও উন্নয়নভিত্তিক বহুমুখী সংস্থায় রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। সংস্থার ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনায় কয়লা গ্যাসিফিকেশন ও কয়লা-ভিত্তিক রাসায়নিক উৎপাদন, তাপবিদ্যুৎ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও শক্তি সঞ্চয়, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও উন্নত উপাদান এবং লৌহ আকরিক-সহ অন্যান্য খনিজ—এই পাঁচটি ক্ষেত্রে প্রসার-সম্পূরক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় চারটি কয়লা থেকে রাসায়নিক উৎপাদন প্রকল্পে প্রায় ৬৯,৩৪৬ কোটি টাকার উদ্যোগ রয়েছে। এর মধ্যে তালচের ফার্টিলাইজার্সের ১২.৭ লক্ষ টন বার্ষিক ইউরিয়া উৎপাদন প্রকল্প, ভারত কোল গ্যাসিফিকেশন অ্যান্ড কেমিক্যালসের ৬.৬ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রকল্প, কোল গ্যাস ইন্ডিয়ার বার্ষিক ৬৩৩.৬ মিলিয়ন নর্মাল ঘনমিটার সিঙ্গেলিক ন্যাচারাল গ্যাস উৎপাদন প্রকল্প এবং কোল ইন্ডিয়া-বিপিসিএল-এর চন্দ্রপুর কয়লা থেকে সিঙ্গেলিক ন্যাচারাল গ্যাস প্রকল্প রয়েছে। কয়লা গ্যাসিফিকেশনের মাধ্যমে কয়লাকে সংশ্লেষণ গ্যাসে রূপান্তর করে সিঙ্গেলিক ন্যাচারাল গ্যাস, অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, মিথানল-সহ বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উচ্চ ছাইযুক্ত ভারতীয় কয়লার উপযোগী প্রযুক্তি তৈরি, গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের দেশীয়করণ, উন্নত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল টুইন, পূর্বাভাসভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং জল, ছাই ও নির্গমন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাণিজ্যিক

কার্যকারিতা ও পরিচালন তথ্য যাচাইয়ের পরই প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের পথে এগোনোর পরিকল্পনা রয়েছে। ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসিফিকেশন নিয়েও পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নিয়েছে কোল ইন্ডিয়া। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের কাস্তা ওয়েস্ট ব্লকে চলছে এই প্রকল্প। প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে ২০২৫ সালের ৩১ মে এবং দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে ২০ জুন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত প্রকৌশল পরিকল্পনা, দিকনির্দেশিত খনন, গ্যাস প্রবেশ ও উৎপাদন কূপ এবং জ্বালানি প্রজ্জ্বলন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ চলছে। প্রকল্পটি ২০২৬ সালে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের চন্দ্রপুরে ২x৮০০ মেগাওয়াটের অতি-উচ্চ দক্ষতার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত যৌথ উদ্যোগে দুই সংস্থার অংশীদারিত্ব হবে ৫০:৫০। একইসঙ্গে কোল ইন্ডিয়ার প্রায় ৫৫০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। ছাদভিত্তিক, মাটিতে স্থাপিত, নিজস্ব ব্যবহারের এবং আন্তঃরাজ্য প্রকল্প-সহ আরও একাধিক সৌর প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। গোরক্ষপুরের চিলওয়া তালে ২০ মেগাওয়াটের ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পও তৈরি করছে সংস্থাটি। জলাশয়ের উপর সৌর প্যানেল স্থাপনের এই পদ্ধতিতে জমির প্রয়োজন কমে। তবে জলস্রব, জলাশয়ের গভীরতা, ঝড়ো হাওয়া, ঢেউ, নোঙর ব্যবস্থা, ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সঙ্গে বিদ্যুৎ সঞ্চয় ব্যবস্থাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তেলঙ্গানার চৌটুল্লালে ১৮৭.৫ মেগাওয়াট/৭৫০ মেগাওয়াট-ঘণ্টা ক্ষমতার ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ এগোচ্ছে। ওড়িশাতেও চারটি জায়গায় মোট ৮০ মেগাওয়াট/৩২০ মেগাওয়াট-ঘণ্টার ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ক্ষেত্রেও ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগড়ে গ্রাফাইট এবং অক্সপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে বিরল মৃত্তিকা মৌল ও বিরল ধাতুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খনিজ সম্পদের মূল্যায়ন, আকরিক প্রক্রিয়াকরণ, পুনরুদ্ধার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বাজার সংযোগের পাশাপাশি খনি থেকে উন্নত উপাদান তৈরির সম্পূর্ণ মূল্যশৃঙ্খলা গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে খনন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, গোলকীকরণ ও আবরণ এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাটারির অ্যানোড উপাদান তৈরির সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। নন-ফেরাস টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সহযোগিতায় অন্তত ৯৯.৯৫ শতাংশ বিশুদ্ধতার আবরণযুক্ত গোলাকার পরিশোধিত গ্রাফাইট তৈরির একটি প্রদর্শনী প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বহুমুখীকরণের সঙ্গে গবেষণা ও উন্নয়নকেও যুক্ত করছে কোল ইন্ডিয়া। ১৯৭৫ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে যে গবেষণা কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল, তা ১৯৯৪ সালের গবেষণা ও উন্নয়ন বোর্ড এবং ২০০৩ সালের

শীর্ষ কমিটি পেরিয়ে ২০২৬ সালের স্বাধীন গবেষণা ও উন্নয়ন নীতি ও নির্দেশিকায় পৌঁছেছে। নতুন কাঠামোয় প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির স্তর ৪ বা তার বেশি এমন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস-ভিত্তিক স্মার্ট খনি, পরিবেশ ও স্থায়িত্ব, বর্জ্য থেকে সম্পদ, প্রযুক্তির দেশীয়করণ, কয়লার বিকল্প ব্যবহার, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং পরিচ্ছন্ন কয়লা ও খনিজ প্রক্রিয়াকরণ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে। আইআইটি মাদ্রাজ, আইআইটি হায়দরাবাদ, আইআইটি-আইএসএম ধানবাদ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেন্টার অব এক্সেলেন্স গড়ে তোলার উদ্যোগও রয়েছে। কোল ইন্ডিয়ার গবেষণা ও উন্নয়ন পোর্টফোলিওতে বর্তমানে ২০টি প্রকল্প রয়েছে, যার অনুমোদিত ব্যয় ২৩১ কোটি টাকা। ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসিফিকেশন, খোলা ও ভূগর্ভস্থ খনিতে ৫জি নেটওয়ার্ক, দ্বিমুখী পেরোডস্কাইট সৌরকোষ এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের অনুসন্ধান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভূ-ভৌত প্রযুক্তির মতো উদ্যোগ তার মধ্যে রয়েছে। কোল ইন্ডিয়ার লক্ষ্য এখন গবেষণা ও প্রযুক্তিকে পরীক্ষাগার থেকে বাস্তব প্রয়োগের স্তরে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য প্রযুক্তি যাচাই, দেশীয় সক্ষমতা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব, ডিজিটাল পরিচালন ব্যবস্থা এবং পর্যায়ভিত্তিক ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সংস্থার বক্তব্য, এই রূপান্তরের মাধ্যমে কোল ইন্ডিয়া ভারতের শক্তি ও খনিজ নিরাপত্তা, আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নতুন ভূমিকা নিতে পারে।

রেশম উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি

২০২৮-২৯-এর মধ্যে শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর লক্ষ্য

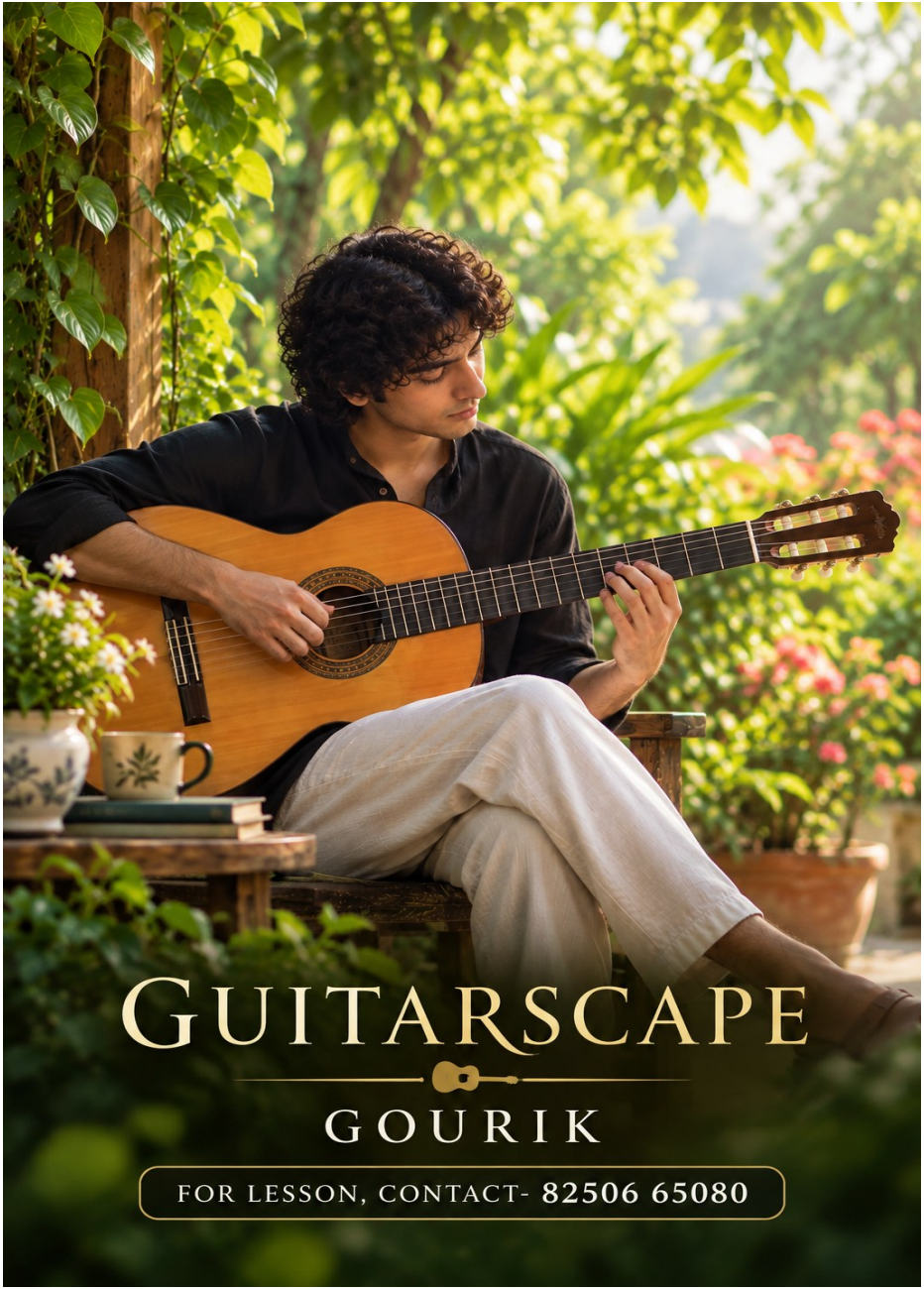
বেঙ্গালুরু: বিশ্বে রেশম উৎপাদনে ভারতকে এক নম্বর স্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। বেঙ্গালুরুতে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং রেশমজাত পণ্য ও প্রযুক্তির প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে দেশের রেশম উৎপাদন ছিল ২৬ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে তা বেড়ে ৪২ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে উৎপাদন ৬০ হাজার মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভুঁত পাতার উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং বছরে রেশমকীট পালনের চক্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে চাষিদের বার্ষিক আয় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রেশমচাষিদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে ‘সেরা রেশমচাষি’ পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজনেরও প্রস্তাব দেন তিনি। গিরিরাজ সিং বলেন, বিজ্ঞানীদের নতুন উদ্ভাবন, উন্নত সংকর প্রজাতি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সুবিধা সরাসরি চাষিদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় রেশমের চাহিদা বাড়ছে, একই সময়ে চিনের রেশম উৎপাদন কমছে বলেও

তিনি উল্লেখ করেন। রেশমচাষ থেকে সুতো তৈরি এবং বয়ন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মূল্যশৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দেশের বস্ত্রবাজারকে ৩০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁতি ও শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে বলেন, দেশের মোট রেশম উৎপাদনে কর্ণাটক শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এই ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করতে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিল্পের প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চ-ঘনত্বের উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রফতানি মানের রেশম উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দেশীয় উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি আমদানির উপর নির্ভরতাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে তিনি জানান। স্থানীয় উৎপাদকদের উপযুক্ত বাজারের সুযোগ করে দেওয়া এবং রেশমচাষ ও বস্ত্রশিল্পে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানান শোভা করন্দলাজে। একইসঙ্গে বহু উদ্যোগপতি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের কাঠামোয় নিজেদের নথিভুক্ত করছেন এবং তাঁদের সহায়তায় ভর্তুকি ও গুণমান উন্নয়ন সংক্রান্ত

বিভিন্ন প্রকল্প চালু রয়েছে বলে তিনি জানান। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের রেশম বিভাগের যুগ্মসচিব পদ্মিনী সিংলা জানান, ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে দেশে ৬০ হাজার মেট্রিক টন রেশম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উচ্চফলনশীল রেশমকীটের সংকর প্রজাতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণমান যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিআইএস এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একাধিক সমঝোতাপত্র বিনিময় হয়। পাশাপাশি ২৮ জন বিজ্ঞানীকে নিয়োগপত্র দেওয়া, কৃতি কর্মী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পুরস্কার প্রদান এবং বোর্ডের বিভিন্ন প্রকাশনা ও সাময়িকী প্রকাশ করা হয়।

এশিয়ান গেম

নয়াদিল্লি: ২০২৬ এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দলগত ইভেন্টে রুপোর পদক জিতলেন সোনম উত্তম মাসকার, এলাভেনিল ভালারিভান ও বিদর্শা কে বিনোদ। তাঁদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, তাঁদের এই সাফল্য আগামী দিনে আরও বহু ক্রীড়াবিদকে অনুপ্রাণিত করবে।



GUITARSCAPE
GOURIK

FOR LESSON, CONTACT- 82506 65080



সম্পাদকীয়

রেশম ভারতের অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে বহু শতাব্দী ধরে যুক্ত। সেই রেশমশিল্পকে এবার নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য সামনে রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমানে দেশের রেশম উৎপাদন ৪২ হাজার মেট্রিক টন। ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে তা ৬০ হাজার মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যের পাশাপাশি ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে বিশ্বে রেশম উৎপাদনে ভারতকে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পের কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। এই লক্ষ্য নিছক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর পরিকল্পনা হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়বে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গ্রামীণ আয়, প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, রফতানি এবং দেশের বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ। ২০১৪ সালে ২৬ হাজার মেট্রিক টন থেকে বর্তমানে ৪২ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছানো উৎপাদনের পরিসংখ্যান অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু পরবর্তী ধাপটি আরও কঠিন। উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রেশমের গুণমান, উৎপাদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতাও বাড়তে হবে। তুঁত পাতার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রেশমকীট পালনের চক্র বাড়ানো এবং উচ্চফলনশীল সংকর প্রজাতির ব্যবহার সেই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি আসতে পারে প্রযুক্তির হাত ধরে। কৃষি ও শিল্পের বহু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উৎপাদনের চরিত্র বদলে দিয়েছে। রেশমচাষও তার বাইরে থাকতে পারে না। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রজাতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিআইএস এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো প্রযুক্তি যদি গবেষণাগার থেকে সরাসরি চাষির হাতে পৌঁছয়, তবে উৎপাদনের পাশাপাশি গুণমান নিয়ন্ত্রণেও পরিবর্তন আসতে পারে। প্রযুক্তি তখন আর প্রদর্শনীর বিষয় থাকবে না, হয়ে উঠবে মাঠের বাস্তব হাতিয়ার। এখানেই চাষির আয়কে কেন্দ্র করে ভাবনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা আয় করার সম্ভাবনার কথা বলা

হয়েছে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার, দাম, ঝুঁকি এবং মূল্য সংযোজনের বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পাবে। রেশমকীট পালন থেকে সুতো তৈরি, বয়ন, নকশা, পোশাক নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন—সম্পূর্ণ মূল্যশৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করা গেলে উৎপাদিত রেশমের প্রতিটি স্তরেই নতুন অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি হতে পারে। কণাটিকের অবস্থান এই ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের মোট রেশম উৎপাদনে রাজ্যটি শীর্ষে। কিন্তু ভারতের রেশমশিল্পের ভবিষ্যৎ কোনও একটি রাজ্যের সাফল্যের উপর নির্ভর করবে না। বিভিন্ন রাজ্যে উৎপাদনের সম্ভাবনা, স্থানীয় প্রজাতি, জলবায়ু এবং চাষের অভিজ্ঞতাকে একত্র করে একটি শক্তিশালী জাতীয় রেশম অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। সেই কাজে বিজ্ঞানী, চাষি, তাঁতি, উদ্যোক্তা এবং বাজার—প্রত্যেকের ভূমিকা রয়েছে। ‘সেরা রেশমচাষি’ পুরস্কারের মতো উদ্যোগও সেই বৃহত্তর পরিবর্তনের অংশ হতে পারে। প্রতিযোগিতা তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা চাষিদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গুণমান উন্নয়নের আগ্রহ তৈরি করবে। পুরস্কারের পাশাপাশি জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। ভারতের রেশমের সামনে আন্তর্জাতিক বাজারের একটি নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এই সুযোগকে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যে পরিণত করতে হলে ‘বেশি উৎপাদন’ থেকে ‘ভাল উৎপাদন’ এবং সেখান থেকে ‘উচ্চ মূল্য সংযোজন’-এর দিকে এগোতে হবে। বিশ্বে এক নম্বর হওয়ার লক্ষ্য তখন একটি পরিসংখ্যানগত অবস্থান থাকবে না; তা হয়ে উঠবে লক্ষ লক্ষ চাষি, তাঁতি ও উদ্যোক্তার আয় ও সম্ভাবনা বৃদ্ধির একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রকল্প। ভারতের রেশমের সুতো তখন দেশের গ্রাম থেকে বিশ্ববাজার পর্যন্ত আরও শক্তিশালী এক অর্থনৈতিক সংযোগ তৈরি করতে পারে। সেই সঙ্গে দেশীয় রেশমের ব্র্যান্ডমূল্য বাড়ানো, রফতানির নতুন বাজার খোঁজা।

পশ্চিমবঙ্গের মৎসচাষ

প্রথম পাতার বাকি অংশ
কৃষি গবেষণা পরিষদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ন্যাশনাল ব্যুরো অব ফিশ জেনেটিক রিসোর্সেস, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ এডুকেশন, নাবার্ড, ন্যাশনাল কো-অপারেশিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, উপকূলীয় জেলজ চাষ কর্তৃপক্ষ, এক্সপোর্ট ইম্পেকশন কাউন্সিল এবং মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন।
কেন্দ্রীয় মৎস্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৫.৪৩ লক্ষ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে উৎপাদন প্রযুক্তি, উৎপাদন-পরবর্তী পরিকাঠামো, প্রক্রিয়াকরণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে। এর ফলে ৩০ লক্ষেরও বেশি মৎস্যজীবীর জীবিকার সঙ্গে যুক্ত একটি বিস্তৃত মৎস্য অর্থনীতি গড়ে উঠেছে।
রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে মোট ৩৪টি ক্লাস্টারও চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে একটি শুঁটকি মাছের ক্লাস্টার রয়েছে। একইসঙ্গে মৎস্যজীবী কৃষক উৎপাদক সংগঠন এবং মৎস্য সমবায়গুলিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি মৎস্য ক্ষেত্রের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনাতো জোর দেওয়া হচ্ছে।
বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়িয়ে মৎস্য উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারের সঙ্গে মৎস্যজীবীদের সরাসরি সংযোগ, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ এবং বিনিয়োগের পরিসর বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হবে। প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব মৎস্যচাষের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আয় ও জীবিকার সুযোগ বাড়ানো এবং রাজ্যের মৎস্য অর্থনীতিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার লক্ষ্যেই এই বৈঠক।

আকাশে সূর্যকিরণ

নয়াদিল্লি: প্রথমবার মেরুঠের আকাশে প্রদর্শনী করল ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্যকিরণ অ্যারোবেটিক দল। ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর দু’দিনের প্রদর্শনী দেখতে মেরুঠে ভিড় জমিয়েছিলেন এক লক্ষেরও বেশি মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পড়ুয়া, ন্যাশনাল ক্যাডেট ফোর্সের সদস্য এবং ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের স্বেচ্ছাসেবকরাও।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সূর্যকিরণ দলের তিন সদস্যের মধ্যে দু’জন কসরত প্রদর্শনকারী পাইলটই মেরুঠের বাসিন্দা। ২০ সেপ্টেম্বরের প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি সূর্যকিরণের প্রদর্শনিকে শৃঙ্খলা, নিখুঁততা, দলগত সমন্বয় ও পেশাদারিত্বের অসাধারণ সমন্বয় হিসেবে বর্ণনা করেন। গত ৩০ বছরে দেশে ও বিদেশে ৮০০-র বেশি এয়ার শো-তে অংশ নিয়েছে এই দল। প্রদর্শনীর প্রথম দিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও সূর্যকিরণের পাইলটদের নিখুঁততা ও সাহসিকতার প্রশংসা করেন।
তেরঙ্গার রঙে আকাশ রাঙিয়ে তাঁদের প্রদর্শনিকে রাজ্য ও দেশের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন রাজ্যসভার সাংসদ লক্ষীকান্ত রাজপুসেয়ী, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সোমেন্দ্র তোমর এবং বিধান পরিষদের সদস্য অশ্বিনী ত্যাগী ও ধর্মেন্দ্র ভরদ্বাজও।
২০২৬ সালের প্রশিক্ষণ পর্ব সফলভাবে শেষ করার পর মেরুঠের আকাশে নিজেদের নতুন বিন্যাস নিয়ে হাজির হয় সূর্যকিরণ। নয়টি লাল-সাদা হক এমকে-১৩২ বিমান নিয়ে দলটি লুপ, ব্যারেল রোল, উল্টো অবস্থায় উড়ান এবং ডিএনএ-র মতো বিভিন্ন কসরত প্রদর্শন করে। হক এমকে-১৩২ বিমানগুলি ভারতে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি। প্রদর্শনের সময় বিমানগুলির মধ্যে দূরত্ব ছিল পাঁচ মিটারেরও কম। সূর্যকিরণের হক বিমানগুলিতে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।

সেমিকনের নতুন ঠিকানা কি পূর্ব ভারত? - একটি রিপোর্ট

শিবাজী লাহিড়ী

২০২৪ সালে সংস্থাটি এসএসএমপিটি-র সঙ্গে সমঝোতা করে সেমিকভাস্টার সংযোজন ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পরিকাঠামো, কর্মী প্রশিক্ষণ, পরিষেবা ইঞ্জিনিয়ার, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যন্ত্রাংশের সহায়তা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছিল। জাগিরোডের প্রকল্পও এই সহযোগিতার আওতায় রয়েছে। ২০২৬ সালের সেমিকন ইন্ডিয়া সম্মেলনের সময় এই সহযোগিতার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর টাটা ইলেকট্রনিক্স ও নেদারল্যান্ডসের বিইএসআই উন্নত সেমিকভাস্টার প্যাকেজিং প্রযুক্তি নিয়ে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ঘোষণা করে। টাটা ইলেকট্রনিক্সের বক্তব্য অনুযায়ী, বিইএসআইয়ের উন্নত প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি জাগিরোডের কারখানার প্রযুক্তিগত প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিতে ব্যবহৃত হবে। পরের দিন, ১৮ সেপ্টেম্বর, জাপানের এনোমোটোর সঙ্গেও টাটা ইলেকট্রনিক্সের সমঝোতা হয়। এর লক্ষ্য ভারতের সেমিকভাস্টার প্যাকেজিং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহশৃঙ্খলা গড়ে তোলা এবং জাগিরোডের কারখানার প্রস্তুতিতে প্রযুক্তিগত ও গবেষণাগত সহযোগিতা করা। ফলে জাগিরোডের প্রকল্পটি ঘিরে এর চারপাশে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, উপাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা-নির্ভর একটি সহায়ক শিল্প-পরিবেশ।
অসম সরকারের কাছে প্রকল্পটির আর একটি বড় গুরুত্ব হল কর্মসংস্থান। টাটা ইলেকট্রনিক্সের হিসাব অনুযায়ী, জাগিরোড প্রকল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৭,০০০-এর বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। সংস্থাটি প্রকল্পটিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের শিল্পায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবেও উল্লেখ করেছে। অসম সরকারের ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষাতেও জাগিরোডের টাটা প্রকল্পকে রাজ্যের শিল্পায়নের বড় পরিবর্তনের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের রাজ্য বাজেট বক্তৃতাতেও ২৭,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ২৭,০০০ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।
এখানে কর্মসংস্থানের প্রশ্টি শুধু সংখ্যার নয়। সেমিকভাস্টার সংযোজন ও পরীক্ষার মতো শিল্পে ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, গুণমান পরীক্ষা, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং বিদ্যে প্রযুক্তিগত পরিষেবায় প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়। ফলে একটি বৃহৎ প্রকল্পের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে স্থানীয় দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
টাটা ইলেকট্রনিক্সের বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, জাগিরোডে ১৭১ একর জমির উপর এই উচ্চ-পরিমাণ উৎপাদনক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে উঠছে। সংস্থাটি এটিকে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যৱহারকারী আধুনিক পরিকাঠামোর কথা জানিয়েছে। ভবিষ্যতে বিপুল সংখ্যক চিপের সংযোজন ও পরীক্ষার সক্ষমতা তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।
এখানে উন্নত প্যাকেজিং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সেমিকভাস্টার ব্যবস্থায় চিপের কর্মক্ষমতা, আকার, শক্তি ব্যবহার এবং বিভিন্ন চিপকে একসঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে প্যাকেজিং প্রযুক্তির ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। জাগিরোডে প্রচলিত প্রযুক্তির পাশাপাশি উন্নত প্যাকেজিং প্রযুক্তি যুক্ত করার পরিকল্পনা তাই প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ পরিধি বাড়তে পারে।
অসমের সেমিকভাস্টার উদ্যোগের দিকে তাকালে একটি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে—জাগিরোডের মূল প্রকল্পকে ঘিরে ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর শিল্প-পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে।
একদিকে রয়েছে রাজ্যের পৃথক সেমিকভাস্টার নীতি অন্যদিকে রয়েছে ২৭,০০০ কোটি টাকার মূল প্রকল্প। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যন্ত্রপাতি সংস্থা, প্যাকেজিং প্রযুক্তি সংস্থা এবং উপাদান সরবরাহকারী। পাশাপাশি কর্মী প্রশিক্ষণ, ইঞ্জিনিয়ার পরিষেবা এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রও এই পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই কারণেই জাগিরোডের

প্রকল্পকে শুধু একটি শিল্প কারখানা হিসেবে দেখলে অসমের সেমিকভাস্টার উদ্যোগের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে না। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি নতুন উচ্চপ্রযুক্তি শিল্প-পরিবেশ গড়ে তোলার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও পরিকল্পিত হচ্ছে।
তবে এর প্রকৃত সাফল্য নির্ধারিত হবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, উৎপাদন শুরু, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল প্রকল্পকে ঘিরে কতটা স্থানীয় ও আঞ্চলিক সহায়ক শিল্প তৈরি হয়—তার উপর। নীতি, বিনিয়োগ এবং অংশীদারিত্ব ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে; এখন নজর থাকবে সেই কাঠামো কতটা কার্যকর শিল্প-পরিবেশে পরিণত হয় তার দিকে।
পশ্চিমবঙ্গ: সম্ভাবনা আছে, কিন্তু শিল্প-বাস্তুতন্ত্র এখনও গড়ে ওঠার পর্যায়ে
পূর্ব ভারতের সেমিকভাস্টার শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। রাজ্যের রয়েছে দীর্ঘদিনের বৈদ্যুতিক শিল্পের অভিজ্ঞতা, একাধিক প্রযুক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার্থী এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পরিকাঠামো। কিন্তু সেমিকভাস্টার শিল্পের মতো মূলধন ও প্রযুক্তিনির্ভর একটি সম্পূর্ণ নতুন শিল্প-পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এখনও পশ্চিমবঙ্গের সামনে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান অবস্থান বুঝতে গেলে প্রথমেই ফিরে দেখতে হয় ২০১২ সালের নীতিতে। সেই সময়ের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিতে সেমিকভাস্টার উৎপাদন, চিপের নকশা,

২০২৩ সালেই পৃথক সেমিকভাস্টার নীতি ওড়িশা ও অসমের, উৎপাদনের পাশাপাশি চিপের নকশা, গবেষণা, প্যাকেজিং ও দক্ষ কর্মী তৈরিতে জোর। পশ্চিমবঙ্গের ২০১২ সালের নীতিতেও ছিল সেমিকভাস্টার কারখানা ও চিপের নকশার পরিকল্পনা। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে পূর্ব ভারতের তিন রাজ্যের নীতি-কাঠামো ও শিল্প-উদ্যোগ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন। দ্বিতীয় অংশ

ভিএলএসআই, প্যাকেজিং, সংযোজন ও পরীক্ষার মতো ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এমনকি সেমিকভাস্টার কারখানা স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ আনার কথাও সেই নীতিতে উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ সেমিকভাস্টার শিল্পের সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের নীতি-চিন্তায় নতুন কোনও বিষয় নয়।
কিন্তু প্রায় দেড় দশক পরে ২০২৬ সালে এসে প্রশ্ন উঠছে—সেই প্রাথমিক নীতি-চিন্তা কতটা বাস্তব শিল্প-পরিকাঠামোয় পরিণত হয়েছে?
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তরের প্রকাশিত নীতি-তালিকায় তথ্যপ্রযুক্তি নীতি, তথ্যকেন্দ্র নীতি এবং ইন্টারনেট কেবল অবতরণকেন্দ্র সংক্রান্ত নীতির মতো নথি রয়েছে। পৃথক একটি চূড়ান্ত সেমিকভাস্টার নীতি বর্তমান সরকারি নীতি-তালিকায় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। তবে একটি সরকারি খসড়া ‘পশ্চিমবঙ্গ বৈশ্বিক সক্ষমতা কেন্দ্র নীতি’-তে ‘পশ্চিমবঙ্গ সেমিকভাস্টার নীতি ২০২৪’-এর উল্লেখ রয়েছে এবং ওয়েবেলেক সেই নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ২০২৪ সালে সেমিকভাস্টার নীতি নিয়ে একটি নীতি-কাঠামো তৈরি হয়েছিল বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও, তার স্বতন্ত্র চূড়ান্ত নথি ও বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা আরও যাচাইয়ের দাবি রাখে।
এই জায়গাতেই পশ্চিমবঙ্গের সেমিকভাস্টার যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্য সামনে আসে। নীতিগত চিন্তা রয়েছে, শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা রয়েছে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প-বাস্তুতন্ত্র তৈরির বাস্তব গতি এখনও স্পষ্টভাবে পরিমাপ করার মতো পর্যায়ে পৌঁছয়নি।
২০২৬ সালে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সেমিকভাস্টার উদ্যোগে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। রাজ্যের বাজেট-পর্বে দুর্গাপুরে সেমিকভাস্টার ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগের কথা সামনে এসেছে। রাজ্যের ২০২৬-২৭ সালের বাজেট-সংক্রান্ত নথি সরকারি অর্থ দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে এই উদ্যোগের গুরুত্ব শুধু একটি নতুন শিল্পপ্রকল্পের সম্ভাবনায় সীমাবদ্ধ নয়।
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-ইতিহাসে দুর্গাপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। ইস্পাত, ভারী শিল্প, ইঞ্জিনিয়ার এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে এই অঞ্চলের। ফলে সেমিকভাস্টার শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নির্ভুল উৎপাদন, যন্ত্রপাতি, রক্ষণাবেক্ষণ, ইঞ্জিনিয়ার পরিষেবা এবং দক্ষ কর্মীর পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে এই শিল্পাঞ্চলকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সেটিও ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে।
তবে এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট রাখা প্রয়োজন—একটি প্রস্তাবিত বা ঘোষিত প্রকল্প এবং একটি কার্যকর সেমিকভাস্টার শিল্প-বাস্তুতন্ত্র এক বিষয় নয়। একটি প্রকল্পকে ঘিরে সহায়ক শিল্প, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন, সরবরাহশৃঙ্খলা এবং স্থানীয় সংস্থার অংশগ্রহণ তৈরি না হলে তার প্রভাব একটি নির্দিষ্ট কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেমিকভাস্টার শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা সম্ভবত তার মানবসম্পদ।
সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬-এর প্রথম দিনেই এই বিষয়টি সামনে আসে। সম্মেলনের মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের সেমিকভাস্টার শিল্পে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অংশগ্রহণ এবং দক্ষ কর্মী তৈরির প্রসঙ্গে সম্পর্কের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান সেমিকভাস্টার মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বা যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির কথাও তিনি জানান।
এই বক্তব্যকে ভারতের বৃহত্তর সেমিকভাস্টার দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে দেখলে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৪০০টি ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিল্পে ব্যবহৃত নকশা-সহায়ক প্রযুক্তির সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে এবং গত চার বছরে প্রায় ৭০,০০০ নকশা প্রকৌশলী প্রশিক্ষিত হয়েছেন।
ইন্ডিয়ান সেমিকভাস্টার মিশন ২.০-তেও দক্ষ মানবসম্পদকে ছাড়াই প্রধান স্তরের অন্যতম করা হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র শিক্ষা-প্রশিক্ষণের বিষয় নয়। এর সঙ্গে ভবিষ্যতের শিল্প-বাস্তুতন্ত্রের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আর এখানেই পশ্চিমবঙ্গের সামনে তৈরি হচ্ছে একটি নতুন সম্ভাবনা—প্রতিভা সংগ্রহের একটি অভিমুখ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটিও ঠিক এখানেই।
যদি পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দক্ষ সেমিকভাস্টার প্রকৌশলী, নকশাবিদ, গবেষক এবং প্রযুক্তিবিদ তৈরি করে, অথচ তাঁদের কাজের জন্য পর্যাপ্ত শিল্প-পরিবেশ রাজ্যের মধ্যে তৈরি না হয়, তাহলে সেই দক্ষ মানবসম্পদের একটি বড় অংশ স্বাভাবিকভাবেই অন্য রাজ্য বা দেশের প্রযুক্তি-কেন্দ্রগুলির দিকে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ যদি শুধু ‘প্রতিভা তৈরি’ করে, কিন্তু ‘প্রতিভাকে ধরে রাখার শিল্প’ তৈরি করতে না পারে, তাহলে রাজ্যের শিক্ষা-পরিকাঠামো অন্য অঞ্চলের সেমিকভাস্টার শিল্পের জন্য মানবসম্পদ তৈরি করার কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এখানে ‘পরিযায়ী কর্মী’ বলতে সাধারণ অর্থে শ্রমিকের স্থানান্তর নয়; বরং উচ্চদক্ষ প্রকৌশলী, গবেষক, নকশাবিদ ও প্রযুক্তিবিদদের কর্মসংস্থানের জন্য অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রবণতাকে বোঝানো হচ্ছে। এর প্রকৃত মাত্রা নির্ধারণ করতে ভবিষ্যতে তথ্যভিত্তিক গবেষণা প্রয়োজন হবে।
সেমিকভাস্টার শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রশ্টি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হতে সময় লাগে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিপ নকশা বা সেমিকভাস্টার প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ চালু করা এবং সেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একটি বাস্তব শিল্প-পরিবেশে কাজের সুযোগ দেওয়া—দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।
পশ্চিমবঙ্গে তাই একই সঙ্গে তিনটি স্তরে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে।
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)